বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার ২০০১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পরিচ্ছেদ ১

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ

১.১ স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জিয়াউর রহমান:

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও এদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। পাকিস্তানী আমলে শুরু হয় নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণের এক নতুন অধ্যায়। প্রতিবাদে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিরোধের আন্দোলন। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর এল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতার সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন এদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বরের মতো ঘৃণ্য হামলা চালায় তখন এর আকস্মিকতায় দিশেহারা হয়ে পড়ে সর্বস্তরের জনগণ। সেই সময় একটি নেতৃত্ব একটি আহ্বানের বড়ই প্রয়োজন ছিল। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বেতারে ভেসে এল একটি কণ্ঠ 'আমি মেজর জিয়া বলছি' এবং সেইসঙ্গে ঘোষণা এল বাংলাদেশের স্বাধীনতার, আহ্বান এল সর্বশক্তি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার। এই আহ্বানে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ-কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, সৈনিকসহ আপামর জনসাধারণ ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তিযুদ্ধে। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলার কিয়দংশে মেজর জিয়া সংগঠিত করেন মুক্তিপাগল সকল শ্রেণীর মানুষকে এবং পরবর্তীতে বিখ্যাত 'জেড ফোর্সের' অধিনায়ক হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেন সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। দীর্ঘ ৯ মাস মরণপণ লড়াই করে অর্জিত হল সবুজ জমিনের ওপর রক্তলাল সূর্যখচিত পতাকাসমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ- আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। লাখো শহীদের পবিত্র রক্ত আর হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত হল এদেশের স্বাধীনতা। গণতন্ত্র এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটবে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব- এই ছিল সেদিনের স্বপ্ন মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

১.২ স্বাধীনতা পরবর্তী দুঃশাসন:

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনা, দেশবাসীর সেদিনের স্বপ্ন কিছুদিনের মধ্যেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সীমাহীন দুর্নীতি, অনাচার, স্বজনপ্রীতি, অযোগ্যতা আর অপশাসনের ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাগ্যে জোটে 'তলাহীন ঝুড়ির' মতো লজ্জাজনক খেতাব। হত্যা, অপহরণ, ছিনতাই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার পরিণত হল। ক্ষুব্ধ জনগণকে দমন করার জন্য রক্ষীবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, লাল বাহিনীসহ নানা দলীয় বাহিনী গঠন করা হল। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের রক্ষক দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে উপেক্ষা ও অবহেলা করা হল, প্রতিষ্ঠা করা হল সমান্তরাল নতুন বাহিনী। এই সব দলীয় বাহিনীর হাতে সিরাজ শিকদারসহ প্রায় ৩০ হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারাল। অবাধ চোরাচালানি, মজুতদারি, দুর্নীতি ও অযোগ্য শাসনের ফলে দেশে সৃষ্টি হল শতাব্দীর ভয়াবহতম মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। রাজধানী ঢাকার রাস্তাঘাটে তখন অভুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকত হাজার হাজার বিবস্ত্র নরকঙ্কাল।

এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী যখন প্রতিবাদে মুখর, ঠিক সেই সময় ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সংবিধান পরিবর্তন করে মহান স্বাধীনতার ফসল গণতন্ত্রকে হত্যা করা হল, প্রতিষ্ঠা করা হল 'বাকশাল' অর্থাৎ একদল ও এক ব্যক্তির শাসন। মাত্র ৪টি সংবাদপত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে বাকি সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হলো। সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, বিডিআর এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে বাকশালের সদস্য করে নিয়ে আসা হল দলীয় রাজনীতিতে। বিচারপতিদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ আদালতের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সরকারের নির্বাহী প্রধান রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ন্যস্ত করার মাধ্যমে হরণ করা হল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

১.৩ আওয়ামী লীগের একাংশ কর্তৃক জারীকৃত সামরিক আইন ও সিপাহী-জনতার বিপ্লব :

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ক্ষমতার লড়াই যখন চরমে পৌঁছে তখন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ

সহচর ও তার মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ঐ মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যসহ সরকার গঠন করেন। আওয়ামী লীগের এই বিদ্রোহী অংশই দেশে প্রথমবারের মতো সামরিক আইন জারি করে। অল্পদিন পরে ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ তারিখে আওয়ামী লীগ সমর্থক সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে খোন্দকার মোশতাক আহমেদের সরকারকে উৎখাত করেন। সেই সঙ্গে স্বগৃহে অন্তরীণ করেন স্বাধীনতার ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান, বীরউত্তম-কে। এই পরিস্থিতিতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর দেশপ্রেমিক সিপাহী-জনতার এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হয়। সিপাহী-জনতা বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানকে, যার ওপরে পরবর্তীতে অর্পিত হয় রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব।

১.৪ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অভ্যুদয়, আদর্শ ও উদ্দেশ্য:

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যখন একনায়কতন্ত্র দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মপরায়ণতার সমাধি রচনা করতে উদ্যত হয়েছিল তখন জিয়াউর রহমানের সামনে প্রধান দায়িত্ব হিসেবে দেখা দেয় ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সুসংহত করা এবং একদলীয় ও একনায়কীয় বাকশাল প্রথার স্থলে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক এই দলের মূল চালিকাশক্তি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সকল, ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীর মানুষকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত করে দেশ গড়ার সংগ্রামে পরিচালিত করাই হচ্ছে বিএনপি'র লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সকল মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার সমুন্নত রাখা এবং বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে একটি 'তলাবিহীন ঝুড়ি' থেকে আত্মমর্যাদাশীল উন্নত দেশে পরিণত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিএনপি তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সস্তা চটুল, ভাওতাবাজি ও ধ্বংসের রাজনীতির স্থলে এদেশে উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতির প্রবর্তন করে বিএনপি।

১.৫ জিয়াউর রহমান দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার কিছু দিনের মধ্যেই দেশে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ গড়ায় এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন। নিজ চোখে তিনি মানুষের সমস্যা দেখেছেন, দেশের সমস্যা অনুধাবন করেছেন। দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নিয়েছেন। জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। দেশবাসী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়া গড়ে তুলেছিলেন সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য, উন্নয়ন কার্যক্রমে সংজ্ঞায়িত হয়েছিল দুর্বার প্রতি। সন্ত্রাসের করাল দ্বারা থেকে মুক্ত স্বদেশে প্রথমবারের মতো বইল শান্তির সুবাতাস, অস্থিতিশীলতা থেকে উত্তরণ হল স্থিতিশীলতায়। অবসান হল রাজনৈতিক শূন্যতার। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রায় ১০ হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জিয়া প্রবর্তিত উন্নয়নের রাজনীতির কতিপয় সাফল্য:

সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান; জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি; বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া; দেশে কৃষি বিপ্লব, গণশিক্ষা বিপ্লব ও শিল্প উৎপাদনে বিপ্লব : সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাশ্রম ও সরকারি সহায়তার সমন্বয় ঘটিয়ে ১৪০০ খাল খনন ও পুনর্খনন: গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন করে অতি অল্প সময়ে ৪০ লক্ষ মানুষকে অক্ষরজ্ঞান দান; গ্রামাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা প্রদান ও গ্রামোন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (জিডিপি) গঠন: গ্রামাঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বন্ধ করা; হাজার হাজার মাইল রাস্তা-ঘাট নির্মাণ : ২৭৫০০ পল্লী চিকিৎসক নিয়োগ করে গ্রামীণ জনগণের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধিকরণ; নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা স্থাপনের ভেতর দিয়ে অর্থনৈতিক বন্ধ্যত্ব দূরীকরণ: কলকারখানায় তিন শিফট চালু করে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি; কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশকে খাদ্য রফতানির পর্যায়ে উন্নীতকরণ; যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুব ও নারী সমাজকে সম্পৃক্তকরণ; ধর্ম মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে সকল মানুষের স্ব স্ব ধর্ম পালনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে

অগ্রগতি সাধন; তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামের জনগণকে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ এবং সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে দেশ গড়ার কাছে নেতৃত্ব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গ্রাম সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন; জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেও নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের আসনলাভ; তিন সদস্যবিশিষ্ট আল-কুদ্দুস কমিটিতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি; দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে 'সার্ক' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ; বেসরকারি খাত ও উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণ; জনশক্তি রপ্তানি তৈরি, পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্পসহ সকল অপ্রচলিত পণ্যের রফতানির দ্বার উন্মোচন; শিল্প খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ।

১.৬ সরকার পরিচালনায় বিএনপি'র পাঁচ বছর (১৯৯১-১৯৯৬) :

রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের সাফল্য, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের দ্রুত উন্নতি এবং দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেশী-বিদেশী একদল চক্রান্তকারী বরদাশত করতে পারেনি। সেই সব চক্রান্তকারীর হাতে ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল ভোটে জয়লাভ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মাত্র ৫ মাস পর এই নির্বাচিত সরকারকে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করে লে. জে. এইচ এম এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখল করেন। গণতন্ত্রের এই সংকটকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরি বেগম খালেদা জিয়াকে দলীয় প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেন। এরপর দীর্ঘ প্রায় পৌনে নয় বছর হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতাসীন থাকাকালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বেগম খালেদা জিয়া তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিরামহীন গণআন্দোলন চালিয়ে যান। তিনি ছিলেন এই গণআন্দোলনের অবিসংবাদিত আপোসহীন নেত্রী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে এরশাদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে তার অবৈধ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নীলনকশার সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও আপোসহীন দেশনেত্রী বেগম জিয়া এই দীর্ঘ নয় বছর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়াননি। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অবশেষে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তীতে ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

বিপুলভাবে জয়লাভ করে এবং বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীরূপে সরকার গঠন করেন। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের নির্বাচন একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হিসেবে দেশে বিদেশে উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

বেগম খালেদা জিয়া যখন সরকার গঠন করে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত গণতন্ত্র সুসংহত করার দায়িত্ব লাভ করেন, রাষ্ট্রীয় তহবিল তখন ছিল প্রায় শূন্য। জাতীয় উন্নয়ন বাজেট ছিল শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজ করছিল চরম বিশৃঙ্খলা। প্রশাসনের সর্বস্তরে ছিল সীমাহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থা।

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার দাযিত্বপ্রাপ্ত বিএনপি সরকারকে বিরাজমান এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে চাঙ্গা করার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে। জনস্বার্থে এসব দায়িত্ব পালনে দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নিকট থেকে যেরূপ সহযোগিতা পাওয়া স্বাভাবিক ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে কোন ক্ষেত্রেই তা পাওয়া যায়নি। বরঞ্চ রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে আওয়ামী লীগ ১৭৩ দিন হরতাল পালনসহ নানাভাবে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছে। নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের নামে তারা ক্রমাগত অন্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার অগ্রাহ্য ও ক্ষুণ্ন করেছে।

১৯৯১ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব বিএনপি'র ওপর অর্পিত হবার পর বৈদেশিক সাহায্য ও নির্ভরশীলতা হ্রাস করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করা হয়। সে নীতি সফল হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রাপ্তির প্রাক্কলিত পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৮শ' ২২ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালেতা বৃদ্ধি শেষে দাঁড়ায় ১৫ হাজার ৪শ' ৫০ কোটি টাকার। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৯৯০-৯১ সালে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭শ' ৯১ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা ৪ হাজার ৮শ' ৭৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। কাজের বিনিময়ে খাদ্যে কর্মসূচি ভিজিডি, ডিআর, টিআর কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালে ১ হাজার ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়। ঐ সময় নগর ও গ্রামাঞ্চলে সড়ক ও সেতু নির্মাণে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

এইসব উন্নয়নমূলক কাজে প্রতিবছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৯০-১৯৯১ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ১শ ২৬ কোটি টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ হাজার ১শ ৫০ কোটি টাকা, অর্থাৎ এ বরাদ্দ ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০-৯১ সালে দেশের রফতানি আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬,০২৭ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪,৪৫২ কোটি টাকায়।

নানা বাধা-বিপত্তি এবং পুনঃ পুনঃ বন্যা, খরা সাইক্লোন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে উন্নয়ন প্রয়াস বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্ভোগ ও অপ্রত্যাশিক বাধা-বিপত্তি এবং পরিকল্পিত নাশকতামূলক রাজনৈতিক কার্যকলাপ সত্ত্বেও বিএনপি আমলের ৫ বছরে অর্জিত সাফল্য দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।

এই সাফল্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

আইন-শৃঙ্খলা:

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা অর্জন করা হয়। দেশে সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি মারাত্মক অপরাধ উল্লেখযোগ্যতায় হ্রাস পায় এবং জনজীবনে স্বস্তি ফিরে আসে।

সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক:

সংসদীয় পদ্ধতি:

জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। দেশ পরিচালনার বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিরোধী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে সংসদীয় স্থায়ী কর্মসূচিসমূহ গঠন করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা :

সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

মেয়র নির্বাচন:

সকল পৌর কর্পোরেশনে প্রত্যক্ষ ভোটে মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং দেশে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ ভোটে মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ভোটার পরিচয়পত্র:

নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক ভোটারকে পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য সংসদে বিল পাস এবং এজন্যে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ:

সংবাদপত্র ও সংবাদ প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। এই সময়ে দেশের প্রথমবারের মতো অনেকগুলি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিবিসি, সিএনএন ও স্যাটেলাইট টিভি অনুষ্ঠান প্রচারের অনুমতি দেয়ার মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়। চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ টিভি স্টেশন এবং ঝিনাইদহে টিভি রীলে স্টেশন স্থাপন করা হয়। রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারে রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক:

উন্নয়ন বাজেট: ১৯৮৯-৯০ সালের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ বিদেশী ঋণনির্ভর ৫ হাজার ১শ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে ১২ হাজার ১শ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করা হয়, যার ৪৩ ভাগ অর্থ নিজস্ব সংসদ থেকে যোগান দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বিএনপি ক্ষমতা লাভের পূর্বে উন্নয়ন বাজেটগুলিতে নিজস্ব সম্পদের যোগান ছিল শতকরা মাত্র ২ থেকে ৩ ভাগ।

মুদ্রাস্ফীতি:

মুদ্রাস্ফীতির গড় ৩% এর নিচে রাখা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও টাকার মান:

৩০.০৬..৯৫ তারিখে বিএনপি সরকারের আমলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩,০৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা একটি সর্বকালীন রেকর্ড। ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ বিএনপি সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের পূর্বে বিরোধী দল কর্তৃক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে একটানা নানাবিধ বাধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও এই মজুতের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ হাজার ৩শ' মিলিয়ন ডলারের মতো। ১৯৯৫-৯৬ সালে টাকার গড় বিনিময় হার ছিল ১ মার্কিন ডলার = ৪০.২০ টাকা।

শিল্প বাণিজ্যে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ :

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে ও বিদ্যুৎ টেলিফোন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে কৃষি, শিল্প, পরিবহন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাসসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এভাবে দেশে প্রথমবারের মতো ব্যাপক বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেয়া হয়।

দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত এবং নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সকল নতুন শিল্পকে প্রথম পাঁচ বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে মঞ্জুর করা হয়।

কৃষি, সমবায়, কৃষক ও তাঁতী :

কৃষকদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ করা হয়। এ বাবদ মোট কৃষিঋণ মওকুফের পরিমাণ ছিল প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা।

তাঁতী ও সমবায়ীদের ঋণের সুদ ও দণ্ডসুদ মওকুফের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় কিন্তু পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার আমলে বাস্তবায়িত হয়নি। কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে কৃষিঋণ বিতরণ পদ্ধতি চালু করা হয়। কৃষি ও সেচকাজের সুবিধার্থে সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল, সেচপাম্পসহ যাবতীয় কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস

করে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা হয়। নদী ভাঙ্গনের পর ৩০ বছরের মধ্যে লুপ্ত জমি জেগে উঠলে তা জমির মালিককে ফেরত দেয়ার আইন প্রণয়ন করা হয়।

বিদ্যুৎ:

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে লোডশেডিং পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখা হয়। শিল্প-কলকারকানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। ৩৩০টি থানায় পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু করে ১৫ হাজার গ্রাম বিদ্যুতায়িত করা হয়। ৫৮১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যথা: বাঘাবাড়ি (৭১ মে:ও), চট্টগ্রাম রাউজান-১(২১০ মে:ও:), ঘোড়াশাল ২১০ মে:ও:) এবং সিলেট কম্বাইন্ড সাইকেল (৯০ মে:ও:) চালু করা হয়। এছাড়া ৭৯৯ মে: ও: বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ৫টি নতুন কেন্দ্রের কাজ শুরু করা হয় এবং আরও ১০২০ মে:ও: উৎপাদনের জন্য ৪টি কেন্দ্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু ও মৎস্য চাষ:

সহজ শর্তে ঋণ ও ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে হাঁস-মুরগি, মৎস্য ও গবাদি পশুর খামার প্রতিষ্ঠার বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে লক্ষ লক্ষ বেকার নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়। দেশে সরকারি সহায়তায় গবাদি পশু পালন উৎসাহিত হওয়ায় বিদেশ থেকে গুঁড়া দুধ আমদানির পরিমাণ টাকার অঙ্কে ছয়শত কোটি থেকে প্রায় একশত কোটিতে নেমে আসে। উন্মুক্ত জলমহাল ইজারা প্রথা বাতিল করে প্রকৃত জেলে ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের মৎস্য আহরণের অবাধ সুবিধা প্রদান করা হয়। 'জাল যার জলা তার' নীতি অনুসরণ করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদেরকে জলমহাল ইজারা দেয়া হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা:

প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যমুনা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু এবং প্রায় ৭০% কাজ সম্পন্ন করা হয়। যেমন গোমতী, মহানন্দা, আত্রাই, শেওলা, ধলেশ্বরী-১ এবং ধলেশ্বরী-২ প্রকৃতি সেতুসহ সারাদেশে তিন শতাধিক ছোট বড় সেতু ও হাজার হাজার কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও পাকাকরণ হয়, যার

মধ্যে ছিল জেলা সদরের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের কয়েক হাজার মাইল জনপথ এবং প্রত্যেকটি উপজেলা সদরের সঙ্গে সংযোগসাধনকারী রাস্তা। ২য় বুড়িগঙ্গা সেতু নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। আধুনিক ইঞ্জিন ও বগি আমদানি এবং রেল লাইনসমূহের সংস্কার করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়। চট্টগ্রামে দেশের আধুনিকতম ও বৃহদায়তদের রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ করা হয়।

টেলিযোগাযোগ :

পাঁচ বছরে সারা দেশে তিন লক্ষ নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে দু'হাজার সালের মধ্যে ৮ লক্ষ নতুন টেলিফোন সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

দেশে সর্বপ্রথম কার্ড ফোন, সেলুলার ফোন, গ্রামীণ আইএসডি ফোন চালু করা হয়।

শিক্ষা :

আইন প্রণয়ন করে সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশের সর্বপ্রথম উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়। দরিদ্র শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির প্রচলন করা হয়। হাজার হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা নির্মাণ ও পুননির্মাণ করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়। দেশে সর্বপ্রথম বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আরও কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়। স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সমাবর্তন উৎসব চালু করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট শুরু করা হয়। গণশিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা হয়। বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের বেতনের অনুদান ৮০ ভাগে বৃদ্ধি ও তাদেরকে টাইম স্কেল দেয়া হয়। প্রতিবছর শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

স্বাস্থ্য:

বৃহত্তর জেলা সদরে ১০০ শয্যা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় এবং ৫০ শয্যার হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলির শয্যা সংখ্যা ৩১ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়। বহুসংখ্যক হাসপাতাল ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স প্রদান করা হয়। এক বছরের কম বয়সী শতকরা ৮৫ ভাগ শিশুকে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। শতকরা ৯০ ভাগ জনগণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

দুঃস্থ মহিলা :

দুঃস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে দুঃস্থ মহিলাদের ঋণদান কর্মসূচি চালু করা হয়।

খনিজ সম্পদ:

বড়পুকুরিয়ার কয়লা এবং মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা উত্তোলন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। ভোলা ও বঙ্গোপসাগরে নতুন গ্যাসক্ষেত্র ও দিনাজপুরে কয়লাক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রতিবছর দুটি করে অনুসন্ধান কূপ খননের উদ্যোগ নেয়া হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়ন :

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত আইনসমূহ দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সামাজিক আন্দোলন শুরু করা হয়।

সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে উপকূলীয় বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়।

সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে বেকার নারী ও পুরুষদের জন্য বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা:

১৯৯১ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় এবং পরবর্তীতে বন্যা ও খরা সফলভাবে মোকাবেলা করে মূলত বিদেশ থেকে সাহায্য না নিয়ে সঠিক পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

উপকূলীয় এলাকায় ১ হাজারের বেশি ‘বহুমুখী সাইক্লোন সেন্টার’ নির্মাণ করা হয়।

ব্যাংক ও বীমা :

বেসরকারি খাতে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেসরকারি খাতে অংশগ্রহণ জোরদার করা হয়। ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নের জন্য সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যার ফলে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা বহুলাংশে দূর হয়। আনসার-ভিডিপি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও আনসার-ভিডিপি সদস্যদের জন্য এ ব্যাংক থেকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশের সহায়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

প্রশাসন :

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পে-কমিশন গঠন ও তার সুপারিশ বাস্তবায়ন করে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা একসঙ্গে দেয়া হয়। তদুপরি অতিরিক্ত ১০% বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন জটিলতা নিরসন ও সহজীকরণ ও অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পেনশন পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রথমবারের মতো অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রী এবং প্রতিবন্ধী সন্তানদের ও আজীবন পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বেসরকারি কর্মচারীদের জন্য ৩ হাজার বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়। সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ২৭ থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছরে উন্নীত করা হয়। ফলে বিলম্বে শিক্ষাজীবন সমাপ্তির কারণে লক্ষ লক্ষ হতাশাক্রান্ত যুবক ও যুবমহিলার কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হয়। পুলিশ, বিডিআর ও আনসার বাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হয়।

সশস্ত্র বাহিনী:

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী সশস্ত্র বাহিনীকে সম্প্রসারিত ও সুসজ্জিত করে একটি যুগোপযোগী আধুনিক বাহিনীরূপে গড়ে তোলা হয়।

মজুরি কমিশন :

মজুরি কমিশন গঠন করে শ্রমিকদের জন্য মঞ্জুরি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। এতদ্ব্যতীত, অতিরিক্ত ১০%, মজুরি বৃদ্ধি করা হয়। গার্মেন্টসসহ ব্যক্তি খাতে ১৭টি সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়।

ইসলাম ধর্মীয় বিষয়াদি :

ঢাকায় স্থায়ী হাজী ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। টঙ্গীকে বিশ্ব এজতেমার জন্য ৩০০ একরেরও বেশি জমি তাবলিগ জামায়াতকে প্রদান করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় মাদ্রাসা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে সমপর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। মসজিদ, ঈদগাঁও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কাজে ব্যাপক হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক :

হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট ও খৃষ্টান কল্যাণ ট্রাস্টে সরকারি অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। তফসিলি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তফসিলি বৃত্তি পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। দুর্গা পূজাসহ অন্যান্য পূজা, জন্মাষ্টমী, শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে রেডিও-টিভিতে প্রচার করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধের আইন :

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান করে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন প্রণয়ন করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা গ্যালান্ট্রি ওয়ার্ড ও বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ :

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠা :

দেশের জলসীমা পাহারা, নৌ সমুদ্রপথে জলদস্যুতা দমন ও চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তিন বিঘা করিডোর :

ভারতের কাছ থেকে তিন বিঘা করিডোর ব্যবহারের অধিকার অর্জন করা হয়।

ফারাক্কা সমস্যা :

ফারাক্কা সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপন এবং গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ভারতকে রাজি করানোর জন্য আন্তর্জাতিক ফোরামের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

পাহাড়ি জনগণ ও চাকমা শরণার্থী :

পাহাড়ি জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হয়। সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শরণার্থীদের দেশে ফেরার এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিচ্ছেদ ২

আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশ : সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, পারিবারিকীকরণ – এক কথায় সর্বগ্রাসী আওয়ামীকরণ

২.১. ১৯৭২-৭৫ সালের আওয়ামী দুঃশাসনের বেদনাদায়ক স্মৃতি :

স্বাধীনতা উত্তর আওয়ামী দুঃশাসনের সময় রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বস্তরে আওয়ামী লীগ কেবলমাত্র অযোগ্য, অপদার্থ ও দুর্নীতিবাজ দলীয় লোকদের নিয়োজিত করেছিল। ফলে দেশকে ঠেলে দেয়া হয় দ্রুত অর্থনৈতিক ধ্বংসের মুখে। ১৯৭৪ সালের মনুষ্যসৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে তৎকালীন সরকারি হিসাবেই ৩০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে, যদিও ঐ সময়ে ০২.১১.৭৪ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদ শিরোনাম ছিল 'দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু'। শুধু অন্ন নয়, বস্ত্রের অভাবে লক্ষ লক্ষ কুলবধূ আব্রু রক্ষা করতে হয় অসমর্থ। ঐ সময় কুড়িগ্রামের চিলমারীর গ্রাম্যবালা বাসন্তীর মাছধরা জাল পরিহিত আলোকচিত্র বিশ্ব বিবেককে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। ঐ দুর্ভিক্ষের সময় শাসকরা কোটি কোটি টাকার চাল, গম, কাপড় ও কম্বল আত্মসাৎ করে মানুষের ঘৃণা ও কুখ্যাতি অর্জন করে।

সম্পূর্ণ নিজেদের ক্যাডার নিয়ে আওয়ামী সরকার গঠন করে রক্ষীবাহিনী। এই বাহিনীকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী চালিয়েছিল ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। এছাড়া গঠন করা হয় লুটপাটের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, লাল বাহিনী ও নীল বাহিনী। শিল্প-কারখানা পাইকারিভাবে জাতীয়করণ করে সেগুলো পরিচালনায় দায়িত্ব দেয়া হয় নিজেদের অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় নেতা-কর্মীদের। শত শত কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য লুট করা হয়। ধ্বংস করা হয় ঐতিহ্যবাহী পাট শিল্প। বন্ধ হয়ে যায় ছোটবড় অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান।

ক্ষমতা কুক্ষিগত ও চিরস্থায়ী করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে হত্যা করলেন গণতন্ত্রকে। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে মাত্র চারটি সংবাদপত্র রেখে, বাকি সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে দেশে একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪-এর মতো কালো আইন ও কুখ্যাত রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৯-ও তিনিই জারি করেন। বিচার বিভাগকে করেন নির্বাহী বিভাগের অধীন।

২.২ হাসিনা সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) আওয়ামীকরণের কতিপয় নমুনা :

১। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি :

প্রতিদিন খুন-ধর্ষণ-ছিনতাই-রাহাজানি-চাঁদাবাজি-দখলবাজির মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ছিল আওয়ামী সরকারের আমলে গণমানুষের বড় প্রাপ্তি। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়েছেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাজী আরেফ, সাংবাদিক মুকুল ও শামছুর রহমান, আইনজীবী হাবিবুর রহমান মণ্ডল, আইনজীবী কালিদাস বড়াল, এডভোকেট নুরুল ইসলাম, ব্যবসায়ী শিপু, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রুবেল, কলেজ ছাত্রী বুশরা, ছাত্রদল কর্মী সজল, ব্যবসায়ী তারাজউদ্দিন, আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সিরেন, যুগ্ম-সচিব নিকুঞ্জবিহারীসহ সারাদেশের হাজার হাজার মানুষ। মানবাধিকার সংস্থাসমূহের প্রতিবেদনানুযায়ী এ ধরনের হত্যার সংখ্যা অন্তত বিশ হাজার। আর এসব খুনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে যেসব আওয়ামী নেতা মানুষের ঘৃণ্য ও ধিক্কার কুড়িয়েছেন তাদের মধ্যে সাবেক এমপি হাজী মকবুল, সাবেক এমপি হাজী সেলিম, সাবেক এমপি ডা. ইকবাল, সাবেক এমপি কামাল মজুমদার ও তার পুত্র জুয়েল, সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ও তার পুত্র দীপু চৌধুরী, দখলকারী সন্ত্রাসী পুত্রদের পিতা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ফুপাতো ভাই চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, গফগাঁওয়ের সাবেক এমপি আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ, ফেনীর ত্রাস সাবেক এমপি জয়নাল হাজারী, ছাতকের সাবেক এমপি ‘বোমা মানিক, নারায়ণগঞ্জের সাবেক এমপি শামীম ওসমান, লক্ষ্মীপুরের আবু তাহের, অবৈধ জি-৩ রাইফেলসহ গ্রেফতার হওয়া সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জি. মোশাররফ হোসেনের পুত্র সুমু, ব্যাংক দখলকারী আওয়ামী নেতা আখতারুজ্জামান বাবু প্রমুখদের নাম আজ আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত সন্ত্রাসীদের নামের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত।

আওয়ামী লীগ আমলে নারী নির্যাতন একটি প্রাত্যহিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার সাধারণ সম্পাদক জসিমউদ্দিন মানিক ক্যাম্পাসে ধর্ষণের সেঞ্চুরি করে তা উদযাপন করে।

সাংবাদিকদের ওপরে চালানো হয় অত্যাচারের স্টিম রোলার। শামছুর রহমান ও মুকুল হত্যা, টিপুকে পিটিয়ে পঙ্গু করা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের অশ্লীল দম্ভোক্তি ‘এই কুত্তার বাচ্চা সাংবাদিককে আমি দেখে নেব’, সাবেক সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সাংবদিকদের দৈহিক নির্যাতনের হুমকি প্রদান, চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণ অফিসে সাংবাদিকদের মারপিট ও ভাঙচুর এবং পরবর্তীতে দু’জন আওয়ামী মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ও ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন কর্তৃক

প্রধান দুই আসামিকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি ঘটনা এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে।

২। সীমাহীন দুর্নীতি :

আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর জরিপে বাংলাদেশকে বর্তমান বিশ্বের ১ নং দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর জন্য দায়ী বাংলাদেশের জনগণ নয়, দায়ী দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আওয়ামী সরকার, তার প্রধানমন্ত্রী ও নেতা-কর্মীরা। আওয়ামী আমলের দুর্নীতির কিছু কিছু নমুনা নিচে তুলে ধরা হল:

সাড়ে সাত শ' কোটি টাকা ব্যয়ে সাতটি অচলপ্রায় মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ক্রয় করে দুই বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার বিপুল পরিমাণ কালো টাকা উপার্জন, নৌ-বাহিনীর জন্য ফ্রিগেট ক্রয়েও বড় রকমের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ:

পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্যদের স্মৃতি রক্ষার্থে শেখ হাসিনা কর্তৃক শুধু একটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটেই (১৯৯৯-২০০০) খরচ ৩২০ কোটি টাকারও বেশি; ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় পিতার মৃত্যুবার্ষিকী পালনের জন্য শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারি তহবিলের কোটি কোটি টাকা অপচয়; পিতার ধানমন্ডিস্থ বাড়ির শান-শওকত বাড়ানোর নিমিত্ত ব্যয় ২৯ কোটি টাকা; স্মৃতিসৌধ স্থাপনের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ; রাষ্ট্রীয় টাকায় দলীয় জনসভা অনুষ্ঠান; নাতনির জন্ম উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় অর্থে দীর্ঘদিনের জন্য সাঙ্গোপাঙ্গসহ শেখ হাসিনার আমেরিকা সফর; হাসিনা সরকারের মন্ত্রী, এমপি, নেতা-কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক ঢাকা শহরে সরকারি খাস জমি, দালানকোঠা, পার্ক, লেক ও নদী দখল; দলীয় ব্যক্তি ও আত্মীয়দের নামে বনানী-গুলশানে ৪০টি আবাসিক প্লট বরাদ্দকরণ; নিজস্ব লোকদের নামে শত শত 'ন্যাম' ফ্লাটের মালিকানা প্রদান; ঢাকা ও চট্টগ্রামে দলীয় লোক ও আত্মীয়দের মধ্যে আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দকরণ, সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে কোটা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপুল অঙ্কের ঘুষ গ্রহণ; বেনামিতে চট্টগ্রাম সিমেন্ট ক্লিংকার ফ্যাক্টরির মালিকানা দখল, টেলিফোন মন্ত্রী হিসেবে মোহাম্মদ নাসিম কর্তৃক ৫৮ জেলা সদরে টেলিফোন প্রকল্প থেকে প্রায় ৭শ' কোটি টাকা আত্মসাৎ; মোহাম্মদ নাসিমের অবৈধভাবে

হেলিকপ্টার ভ্রমণের কারণে ৫ বছরে প্রায় ৮ কোটি টাকা খেসারত। নাসিমের স্ত্রী ও তার বান্ধবী ঢাকার পুলিশ কমিশনারের স্ত্রী কর্তৃক ঢাকা মহানগরের ২১টি থানার ওসি বদলির জন্য ৪ কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণ; ব্যাংকপ্রতি ৫ কোটি টাকা এবং বীমা কোম্পানীপ্রতি দেড় কোটি টাকার বিনিময়ে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর অনুমতি প্রদান; সরকারি টাকার পরিবার পরিজন ও সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দূরদেশে দীর্ঘ ব্যক্তিগত সফর ও একের পর এক ডক্টরেট ডিগ্রি ক্রয়; দেশবাসীকে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রেখে শেখ হাসিনা কর্তৃক নিজের নিরাপত্তার মিথ্যা অজুহাতে সকল প্রকার অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ কয়েক শ' কোটি টাকা মূল্যের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি নিবাস 'গণভবন দখল এবং পদস্থ কর্মকর্তাগণ সমৃদ্ধ বিভিন্ন পদের ১৯৭৫ জনের এসএসএফ বাহিনীর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের জন্য আইন পাস।

অন্যান্য প্রতিমন্ত্রী ও নেতাদের মধ্যে দুর্নীতিতে শীর্ষে ছিলেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, আমির হোসেন আমু, মো. নাসিম, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, ড. ম, খা আলমগীর, রাশেদ মোশাররফ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, আব্দুল জলিল, ডা. মোজাম্মেল হোসেন, সাবের হোসেন চৌধুরী, শেখ ফজলুর করিম সেলিম, ফায়জুল হক, শেখ হেলাল, আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, হাজী সেলিম, আলহাজ মতবুল হোসেন, ডা. এইচবিএম ইকবাল, মেয়র হানিফ, মেয়র মহিউদ্দিন প্রমুখ।

৩। বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ খাতে আওয়ামী সরকারের হিমালয়সম ব্যর্থতার কারণে শিল্প-কারখানার উৎপাদন, সেচযন্ত্রের ব্যবহার, ছাত্রছাত্রীদের লেড়াপড়া, হাসপাতাল-অফিস-আদালত ইত্যাদি কাজকর্মসহ জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদুৎ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত শেখ হাসিনা যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলতেন তখন দেশবাসীর কাছে তা শোনাত পরিহাসের মত।

৪। প্রশাসনের দলীয়করণ:

আওয়ামীপন্থি অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে বসিয়ে প্রশাসনকে অচল করা হয়। পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করা হয় দলীয় ক্যাডার বাহিনীর মতো। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিকে জেল-জুলুম, চাকুরিচ্যুত ও 'ডগ-স্কোয়াড' লেলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে

করা হয় স্তব্ধ। ফায়দা লুটে নেয় শুধু তথাকথিত ‘জনতার মঞ্চের’ কুখ্যাত আমলা মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সফিউর রহমান, রবিউল মোক্তাদির, শেখ হাসিনার ফুপাতো বোনের স্বামী রশিদুল আলম গংরা।

৫। বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ ও চাপ সৃষ্টি :

মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে রাজপথে লাঠি মিছিল, তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে হামলা, জাতীয় সংসদে ও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী কর্তৃক বিচারপতিদের উদ্দেশে অশালীন ভাষায় কটূক্তি এবং সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে রাতের অন্ধকারে বস্তি বসিয়ে আওয়ামী লীগ এক ন্যক্কারজনক অধ্যায় রচনা করে। সুপ্রিম কোর্ট শেখ হাসিনাকে বিচারকদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যের জন্য দুই দুইবার কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়।

৬। জাতীয় সংসদকে দলীয় কার্যালয়ে পরিণতকরণ:

বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ না দেয়া, অসত্য বক্তব্য ও ভুল তথ্য প্রদান করা, শেখ হাসিনা ও তার দলীয় সংসদ সদস্যদের অশালীন ও আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ এবং স্পিকার কর্তৃক আওয়ামী কর্মিসুলভ আচরণ ও পক্ষপাতিত্ব বস্তুতপক্ষে জাতীয় সংসদকে আওয়ামী লীগের নিজস্ব কার্যালয়ে পরিণত করেছিল।

৭। মুক্তিযুদ্ধকে দলীয়করণ

যদিও মুষ্টিমেয় ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যতীত দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, আওয়ামী লীগ নিজ দল ছাড়া অন্য কাউকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। শেখ মুজিবুর রহমান স্বেচ্ছায় হানাদার বাহিনীর নিকট ধরা দিয়ে সমগ্র জাতিকে চরম বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের মুখে ফেলে রেখে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। অন্যদিকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দ্রুত স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জীবন বাজি রেখে রণক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ জিয়া এবং বঙ্গবীর জেনারেল

ওসমানীসহ অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকাকে ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ।

৮। নির্বাচন কমিশন:

'জনতার মঞ্চের' নেতা আওয়ামী লীগের সেবাদাস সুবিধাবাদী আমলা সফিউর রহমানকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার এই প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা বিনষ্ট করেছে। আওয়ামী আমলের সকল উপনির্বাচনে সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ, আওয়ামী সন্ত্রাস ও ফলাফল নিয়ে কারচুপি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে বিতর্কিত করে তোলে।

৯। পাবলিক সার্ভিস কমিশন :

আওয়ামী লীগ নেতা ড. মোস্তফা চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও অন্যান্য দলীয় ব্যক্তিদের সদস্যসহ নানাপদে বসিয়ে কমিশনকে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। বিগত ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১০। প্রতিরক্ষা :

প্রচলিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে শেখ হাসিনা তার ফুপা মেজর জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমানকে এলপিআর থেকে ফিরিয়ে এনে দীর্ঘ চার বছরের জন্য সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগদান করেন। পরে জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে চাকুরি শেষ হওয়ার আগেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন।

মিগ-২৯ ফ্রিগেট ক্রয়ে পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি, বড়াইবাড়ি ও পদুয়ায় শেখ হাসিনার নতজানু বিদেশ নীতি, ভাওতাবাজির পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত তথাকথিত শান্তিচুক্তি ও গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি শেখ হাসিনা ও তার সরকারের দুর্নীতি ও দেশের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের প্রমাণ বহন করে।

১১। কুক্ষিগত রেডিও-টিভি :

আওয়ামী আমলে সরকারি রেডিও-টিভি শতকরা ১০০ ভাগ দলীয় প্রচার মাধ্যমে পরিণত হয়। বিটিভিতে শেখ হাসিনা, তার পিতা ও আওয়ামী নেতা-কর্মীদের প্রচার অধিক হারে ও নগ্নভাবে হয় যে জনগণ বিটিভির নতুন নামকরণ করে বাপ-বেটির টিভি। আটটার সংবাদের নাম দেয় ‘ঠাট্টার সংবাদ’।

পানিচ্যুত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আওয়ামী সরকার রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসনের নামে যে আইন পাস করেছে তাকে রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন না বলে বলা যায় ‘আয়ত্তশাসন’। অথচ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল রেডিও-টিভির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

১২। অর্থনৈতিক দুরবস্থা:

আওয়ামী লীগ আমলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধসে পড়ায় কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ:

টাকার অবমূল্যায়ন:

টাকার অবমূল্যায়ন করা হয় ১৮ বার, যার ফলে টাকার মূল্য কমে যায় ডলারপ্রতি ১৭ টাকা।

শেয়ার মার্কেট :

শেয়ার মার্কেট ধ্বংস করা হয় অর্থমন্ত্রীর পুত্রবধূ, আওয়ামী ফায়দাভোগকারীগণ ও ভারতীয় মাড়োয়ারি বেনিয়াদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। পথের ফকির হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ।

রাজস্ব আয়:

রাজস্ব আয় বাড়াতে চরমভাবে ব্যর্থ আওয়ামী সরকার শুধুমাত্র ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে দেশের ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নেয় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। এ হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের চার্টার্ট ব্যাংকের মাত্র এ অঙ্ক ৯ হাজার কোটি টাকা। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বেড়েছে দফায় দফায়, নিত্যব্যবহার্য পণ্যের ওপর বসেছে উচ্চ হারের শুল্ক। বীজ, সার, কীটনাশক, ডিজেল এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসলের উৎপাদন খরচ বেড়েছে অস্বাভাবিক মাত্রায় অথচ উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়নি কৃষক।

চোরাচালান:

বিদেশী পণ্যের অবাধ চোরাচালানের কারণে দেশী পণ্য প্রচণ্ডভাবে মার খেয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে শত শত শিল্প কারখানা। বৈধ-অবৈধ পথে আসা হাজার হাজার কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশকে পরিণত করেছে ভারতের একটি বৃহৎ একচেটিয়া বাজারে।

প্রবৃদ্ধির হার:

জনগণের আয় বৃদ্ধি পায়নি অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং দফায় দফায় বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের দাম বাড়ানোতে ব্যয়ের বোঝা বেড়েছে অনেক। বেকার সমস্যা হয়েছে প্রকট। এতদসত্ত্বেও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি দেখিয়ে জনগণকে বোকা বানানোর অপচেষ্টা করেছে সরকার।

১৩। নামকরণ ও পারিবারিকীকরণ:

বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, স্টেডিয়াম, বিমানবন্দর, রাস্তাঘাট, সেতু, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পদক ইত্যাদি সবকিছুর নামের সঙ্গে শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম যুক্ত করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদিতে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি প্রদর্শন বাধ্যতামূলককরণ ও তার কোন সমালোচনা করা চলবে না এই মর্মে আইন, জাতির পিতার পরিবারের নিরাপত্তা আইন ২০০১, শেখ হাসিনাকে গণভবন ও এসএসএফ দ্বারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান, শেখ রেহানাকে ধানমন্ডিতে বিশাল বাড়ি বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ঘটনা সারাদেশের মানুষকে স্তম্ভিত করে।

১৪। আওয়ামী শাসনামলে মহিলাদের মান-সম্ভ্রম নিরাপদ ছিল না। ০৮.১০.২০০০ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্ষিতা হন ৮১৩৭ জন এবং নির্যাতনের শিকার হন ২৬০৭৯ জন নারী ও শিশু। এরূপ কয়েকটি লোমহর্ষক ঘটনার শিকার ছিল: টঙ্গীর পাগার মধ্যপাড়ার চার বছরের শিশু মিষ্টি, ঢাকার আদালত ভবনে ধর্ষিতা শিশু তানিয়া, নারায়ণগঞ্জ আদালত এলাকায় গণধর্ষণের শিকার গৃহবধূ শিল্পী আক্তার, পটুয়াখালীর অন্তঃসত্ত্বা হনুফা বেগম, গুলশান থানার অভ্যন্তরে গণধর্ষিতা ব্রিটিশ মহিলা ও একজন মার্কিন কূটনীতিকের স্ত্রী, চাটমোহর থানার দিলালপুর গ্রামের রোমানা

খাতুন, ডেমরা থানার নাজমা বেগম, ঝিনাইদহে ধর্ষণের ফলে নিহত অজিফা ও তার মা. রাউজানের ধর্ষিতা ও পরে পুড়িয়ে মারা গার্মেন্টস কর্মী সীমা রাণী প্রভৃতি।

১৫। শিক্ষাঙ্গন :

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই দেশের প্রায় সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও রেজিস্ট্রারসহ শীর্ষ পদগুলোতে এবং সিন্ডিকেটসহ নীতিনির্ধারণী সকল পরিষদে দলীয় লোকদের বসায়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সহস্রাধিক নেতা-কর্মীকে যোগ্যতা বিচার না করেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো ছাত্রলীগ ক্যাডারদের খুন, ধর্ষণ টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজির আখড়াতে পরিণত হয়। ছাত্রলীগ ব্যতীত অন্যান্য দলের প্রকৃত ছাত্রদের হল থেকে বের করে দিয়ে ছাত্র নামধারী আওয়ামীপন্থি বহিরাগতদের আশ্রয় দেয়া হয়।

শেখ হাসিনা সরকার পরীক্ষার নকলবাজিতে এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করে। নকল প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়ার পরিবর্তে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীদের দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে লাঞ্ছনা ও প্রহার করা হয়। এই সরকার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা-জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। শেখ হাসিনা হয়ত জানেন না যে এসব শিশু তার মতো পাইকারি দরে ডক্টরেট ডিগ্রি ক্রয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করে না; তারা চায় লেখাপড়া করে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে।

১৬। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ : কথা ও কাজের গরমিল :

১৯৯৬ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনা ও অন্যান্য আওয়ামী নেতারা প্রকাশ্যে বারবার অতীতের ভুলসমূহের জন্য ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে সদাচরণের মুচলেকাস্বরূপ জাতিকে অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। ঐসব প্রতিশ্রুতি যে ভাওতাবাজি ছাড়া আর কিছুই ছিল না তা পরবর্তীতে তাদের শাসনামলে প্রমাণিত হয়। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, দেশ থেকে দুর্নীতির মুলোৎপাটন, শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের প্রসার, প্রচার

মাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পদের উন্নয়নসাধন, শিক্ষক, কর্মচারী ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণ, পাটের দাম মণপ্রতি ৫০০/= টাকা করা ইত্যাদি অসংখ্য অঙ্গীকারের কোনটিই পালন করেনি আওয়ামী সরকার। জনগণের কাছে এগুলো আজ প্রহসনের মতো মনে হয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ কালো আইন, অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন তো বাতিল করেননি বরং জননিরাপত্তা আইন নামে আরেকটি নতুন কালো আইন জারি করেছে।

পরিচ্ছেদ-৩

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার : সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার শপথ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনের শাসন এবং জনগণের ইচ্ছার সার্বভৌমত্বের বিশ্বাস করে। বিএনপি মনে করে যে, বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থার একটি আধুনিক রাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গতানুগতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের সামগ্রিক ও স্থায়ী কল্যাণসাধনও এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ এই দায়িত্বের পরিধি বিস্তৃত করেছে এবং এক নতুন মাত্রা যোগ করার দাবি নিয়ে এসেছে। এই বহুমাত্রিক দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে সময়ের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে মারাত্মক অবনতি হয়েছে, আত্মীয়করণ... দলীয়করণের সর্বগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে যেভাবে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামো... তাতে সন্ত্রাস দমন, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, দুর্নীতি দূরীকরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি, জলাবদ্ধতা ও যানজট সমস্যার সমাধান, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার প্রদান সময়ের দাবি :

এই বিশ্বাস ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে আমরা ঘোষণা করছি যে–

৩.১ আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা :

আল্লাহর মেহেরবানিতে সরকার গঠনে সক্ষম হলে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের প্রথম কাজ হবে দলমত নির্বিশেষে সকলের সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে জনগণের জান-মাল ও সম্ভ্রম নিশ্চিত করা এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্যে আমরা যে কোন মূল্যে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনব ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব। হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ধর্ষণের মতো অপরাধ দমন করে আমরা দেশকে মানুষের বসবাসযোগ্য করে গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ।

এই লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে যথাযথই প্রশিক্ষিত যোগ্য, শক্তিশালী ও কার্যকর করা হবে। এদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হবে এবং অবৈধ অস্ত্র সরবরাহের সকল উৎস বন্ধ করা হবে। অপরাধ দমন ও অপরাধীদের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে আইন চলবে নিজস্ব ও স্বাভাবিক গতিতে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী থানায় এজাহার নেয়া নিশ্চিত করা হবে এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার প্রভাব কিংবা সুপারিশের প্রয়োজন হবে না। নারী ও শিশু নির্যাতন, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অপরাধ অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং সন্ত্রাসীদের বিচার ও শাস্তি দ্রুত সম্পন্ন করার ফল প্রত্যেক জেলায় বিশেষ আদালত স্থাপন করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

সমাজের সকল স্তরে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের সংস্কার করা হবে এবং পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সময়োপযোগী ও অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে জনগণকে শাসন করার জন্য নয়, সেবা করার জন্য কাজে লাগানো হবে।

৩.২ দুর্নীতি দমন :

রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বিদ্যমান সীমাহীন দুর্নীতির অবসান ঘটানো ছাড়া উন্নয়ন ও জনকল্যাণের কোন প্রয়াসই সফল হবে না। বিএনপি তাই দুর্নীতির মুলোৎপাটনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে। এই লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে। দুর্নীতি দমন বিভাগকে পুনর্গঠন করা, দুর্নীতি দমন কমিশন নামে একটি সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। এসব ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সমপর্যায়ের সকল ব্যক্তির সম্পদের হিসাব গ্রহণ ও প্রকাশ করা হবে।

৩.৩ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা :

বিদ্যুৎ সেক্টরের মারাত্মক অব্যবস্থা ও সীমাহীন দুর্নীতির কারণে বিগত পাঁচ বছর জনগণ যে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছে এবং দেশের শিল্প-কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়ে জাতি যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তার দ্রুত অবসানের লক্ষ্যে বিএনপি নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে :

‘সকলের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করা হবে। এই লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যুক্তিসংগত মূল্যে নির্ভরযোগ্য ও উন্নত মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে এবং ব্যবস্থাপনার দিক থেকে তাকে প্রতিযোগিতামূলক ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা হবে।

‘সিস্টেম লস’ কমিয়ে আনা হবে এবং বিদ্যুৎ বিল আদায় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ভারসাম্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সেক্টরের সংস্কার (রিফর্ম) করা হবে। প্রতিটি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের কর্মী বাহিনীকে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি খাতে টার্গেটভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ত্বরান্বিত করা হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ বিল মওকুফের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

৩.৪ প্রশাসন ও ন্যায়বিচার:

দেশের প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে যথেচ্ছাভাবে দলীয় এবং আত্মীয়করণ করার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা, মর্যাদা এবং সামর্থ ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এর বিষময় ফল ভোগ করতে হচ্ছে দেশ ও দেশের জনগণকে। এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএনপি ঘোষণা করছে যে–

দেশে সংবিধানে বর্ণিত চার মূলনীতি- সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখা হবে এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করা হবে। ইসলাম ধর্মের পরিপন্থি কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না।

প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের মাপকাঠি হবে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা।

রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

আইনের শাসন নিরঙ্কুশ করার জন্য বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হবে।

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকারি রেডিও-টেলিভিশনকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমূলক করা হবে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। বেসরকারি উদ্যোগে দায়িত্বশীল রেডিও-টিভি প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশে উৎসাহ দেয়া হবে।

প্রশাসনের সর্বস্তরে জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ড ও সেবার গুণগত মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির সুসমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সেবার মূল্যায়ন ও যথাযোগ্য মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে এবং জীবনমান ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ বেতন-ভাতা নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে স্থায়ী পে-কমিশন গঠন করা হবে।

আওয়ামী আমলে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে যেসব কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে তাদের আপীল কেসগুলো বিবেচনা/পুনর্বিবেচনা করে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বিগত বিএনপি সরকারের আমলে যেভাবে পদবি পরিবর্তন করে সচিবালয়ের কিছু কিছু পদের মর্যাদাশীল নামকরণ করা হয়, একইভাবে সচিবালয়ের বাইরের সমপর্যায়ের পদসমূহেরও নামকরণ করা হবে।

সরকারি চাকুরির বিভিন্ন স্তরে পদোন্নতি ত্বরান্বিত করা হবে এবং আওয়ামী লীগ সরকরের আমলে যারা রাজনৈতিক কারণে পদোন্নতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে বা হয়রানির শিকার হয়েছে তাদের 'কেস' পুনর্বিবেচনা করা হবে।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা, আর্থিক দৈন্যতা নিরসন এবং যুদ্ধাহত, অসহায় ও দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও দুর্যোগ মোকাবিলায় মতো জাতীয় তৎপরতায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পৃথক মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের গণতান্ত্রিক অধিকার, বিনিয়োগের সহজ ব্যবস্থা, তাদের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণের জন্য পৃথক বিভাগ/মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রশাসনকে গতিশীল করে জনগণের আরও কাছে নিয়ে যাওয়া এবং জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

৩.৫ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি :

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করা হবে।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পবিত্র দায়িত্ব নিয়োজিত দেশপ্রেমিক প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহকে কু-রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে আরও দক্ষ, আধুনিক, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আবদ্ধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

বিডিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীকে আরও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের মাধ্যমে সুসংবাদ ও সুরক্ষা বাহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। সেই সঙ্গে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অধিক সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা সদস্য নিয়োগ ও যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করা হবে। এই... সংগঠনকে স্থানীয় ও জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও দেশ গড়ার বিভিন্ন কর্মসূচিতে কার্যকরভাবে নিয়োজিত করা হবে। জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ এবং সকল রাষ্ট্রের সাথে সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে সহযোগিতামূলক ...
/////////////